কহিলে কথা কালী, আমরা কি তা বুঝতে পারি ?

দধীচি

পূর্বরাগ:

সঞ্জয় বলিলেন:

হে ধৃতরাষ্ট্র! আজ একমহাকাণ্ড ঘটেছে।অস্ট্রেলিয়ান দার্শনিক ডেভিড ক্লার্ক, যিনি সারাজীবন উদ্ভট সব চিন্তাধারা করেছেন, হঠাৎ ইহাজির দধীচি মুনির কুটিরে।কুটিরের সামনে তখন হাঁড়ি ভর্তি খিচুড়ি বসছে, পাড়ার ছেলেরা রেডিওতে রণজিৎ মল্লিকের সংলাপ চালাচ্ছে, আর মুনি ঠান্ডা মাথায় চপ খাচ্ছেন!

ক্লার্ক হাত নেড়ে হাহাকার করে বলিলেন;

'হে মুনি, বাঙালিরা দর্শন ভুলে গেছে! একসময় এরা চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে নিয়ে ঝগড়া করত, হেগেলকে গাল দিত, উপনিষদ পড়ে মাথা ঘামাত। এখন দোকানে ঢুকলেই শোনা যায়;আজ ইলিশ ক'টাকা?' অথবা; 'কে আই পিএল জিতবে?' এরা কি তবে দর্শন খেয়ে ফেলল?'

দধীচি মুনি হেসে লুচি ছিঁড়ে বলিলেন;

'হে ক্লার্ক, বাঙালি দর্শন ছেড়ে দেয়নি, বরং নতুন দর্শন আবিষ্কার করেছে। তারা বলে;'ঈশ্বর আছেন কিনা জানিনা, তবে ইলিশ যদি সাতশোর নিচে মেলে, তবে অবশ্যই তিনি আছেন।'

ক্লার্ক মাথায় হাত দিলেন;

'হায় হায়! ইংরেজরা এখন শুধু ফুটবল বোঝে, আমেরিকানরা বার্গার গোনে, জার্মানরা গাড়ি বানায়। আমি ভেবেছিলাম, দর্শনের শেষ আশ্রয় বাঙালি। অথচ এরা সকালবেলায় সূর্যোদয় দেখেনা, বরং হোয়াটসঅ্যাপে ফরোয়ার্ড করে, 'Good Morning– Have a Nice Day!'

মুনি হেসে বললেন;

'চিন্তা করোনা, দার্শনিক। তোমার দর্শন আমি এমন ভাবে বাঙালির সামনে রাখব, যেন তারা ভাতের সঙ্গে ঝালঝাল কচুর লতি খাচ্ছে। স্ক্রু (Screw)-আলগা, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান, কফি হাউস, নিউ মার্কেট, অটো ভাড়া;সব ঢুকে যাবে।পাঠক একদিকে হেসে বলবে 'আহা!' আর অন্যদিকে মাথা চুলকে ভাববে - 'আরে সত্যিই তো!'

সঞ্জয় বলিলেন;

এইভাবে দর্শনকে মাছের ঝোলের মতো বাঙালির থালায় পরিবেশন করার অঙ্গীকার করিলেন দধীচি মুনি। আর তারপরই শুরু হইল সেই কাহিনি...

'ঈশ্বর আমায় বলেছেন- এই কাজ করো।' আহা, কী মিষ্টি শোনায় না! কিন্তু ইতিহাস উল্টালে দেখা যায়, এ ইমিষ্টি কথাটার ঘাড়েই চাপানো আছে লাখ লাখ প্রাণের হাহাকার। যুদ্ধ, রক্তপাত, জ্বালাও-পোড়াও-সবই নাকি ঈশ্বরের নামে। ঈশ্বর নিশ্চয়ই ওপর থেকে বিরক্ত গলায় বলেন, 'ধুরমশাই, আমিতো এরকম কিছু বলিনি, আমার নামে এসব কাণ্ডকারখানা কেন?'

আজও অবস্থা আলাদা নয়। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই দেখি, কারও মাথায় কী ভূত চেপেছে কে জানে- সে হাঁকছে, 'ঈশ্বর আমায় বলেছেন, আমি ওর মাথায় হাতুড়ি মারি।' কারও হাতে বাইবেল, কারও হাতে কোরআন, কেউ আবার গুরুজির ঝকঝকে ব্যাখ্যা টেনে আনে। একবার যদি বলা যায় 'ঈশ্বর কানে কানে বলেছেন'- তাহলেই বাকি সব দায় ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপানো সহজ।

কিন্তু মজা এখানেই- আমি যদি বলি ঈশ্বর আমায় বলেছেন, আর পাশের বাড়ির ভদ্রলোক সমান গলায় বলে ঈশ্বর তাঁর সঙ্গেই আড্ডা দিয়েছেন, তাহলে অবস্থা হবে সলিলচৌধুরীর গানের মতো-'তুমি বলো হ্যাঁ, আমি বলি না।' কার ঈশ্বর আসল, কার ঈশ্বর নকল-এই নিয়ে এমন ঝগড়া বাঁধবে যে, পাড়ার মোড়ের দাবার আড্ডাও হার মেনে যাবে।

উদাহরণ তো কম নয়। একই ধর্মের ভেতরেই কেউ বলে- নারীর আসন ঘরে, কেউ বলে-নারীর আসন সমাজে। এদিকে দু'পক্ষই দাবি করছে, 'আমাদের কথাই ঈশ্বরের আসল ইচ্ছা।' শুনে মনে হয় ঈশ্বর বুঝি সত্যিই ডবলশিফটে কাজ করছেন-সকালে একপক্ষকে বলে যাচ্ছেন এক কথা, রাতে অন্যপক্ষকে উল্টোটা। আর এই ঝগড়া মেটাবে কে? আদালতের সু(কু!) খ্যাত উকিলেরও এখানে কুলাবে না।কেউ কেউ তখন খুব গম্ভীর হয়ে বলেন, 'চলুন, এহেম এহেম ধর্মগ্রন্থটা একটু মন দিয়ে পড়ি, তাহলেই সব রহস্য মিটে যাবে।' যেন এহেম এহেম ধর্মগ্রন্থটা কোনো ফেলুদার কেস, একবার গোড়ায় থেকে পড়ে ফেললেই ধরা দেবে আসল খুনি। অথচ অবস্থা হয় এমন- একজন বলে খুনি লালটু, আরেকজন বুক চাপড়ে বলে কালু। শেষ পর্যন্ত রহস্য মেটার আগেই লালটু-কালু দুজনেরই প্রাণসংশয় হয়।

কিন্তু আসল প্রশ্ন থেকে যায়; যদি সত্যিই ঈশ্বর কথা বলেন, আমরা তাঁকে আদৌ বুঝতে পারব কি? আমার মতে, এই বিশ্বাসের সবচেয়ে দারুণ পাল্টা যুক্তি (যদিও একটু ঘুরপথে আসে) পাওয়া যায় দার্শনিক লুডভিগভিট গেনস্টাইনের চিন্তায়। তিনি এক আলোচনায় বলেছিলেন- 'যদি সিংহ কথা বলতে পারত, আমরাতাকে বুঝতেই পারতাম না।' এখন কেউ ভাববেন না, ভিটগেনস্টাইন সিংহ-শিকার বা অরণ্যের সঙ্গে মানুষের কমিউনিকেশন নিয়ে গবেষণা করছিলেন। আসল ব্যাপারটা অন্য।

ভিটগেনস্টাইনের বক্তব্য হলো, যোগাযোগ করার জন্য শুধু শব্দ থাকলেই হয় না, আমাদের আচরণ, অভ্যাস, জীবনযাত্রার অনেক মিল থাকতে হয়। ভাষা হল সবচেয়ে মৌলিক মানবিক কর্মকাণ্ড, আর ভাষা তৈরি হয় মানুষের জীবনযাত্রার ভেতর থেকে। তাই ভাষাকে আলাদা করে বোঝার চেষ্টা করা মানে ঠিক যেন স্রেফ পদার্থবিদ্যার সূত্র মেনে রবীন্দ্রসংগীত বিশ্লেষণ করার চেষ্টা। 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছেদ; এর ব্যাখ্যা যদি কেউ দিতে বসে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের টেবিল সাজিয়ে, তো শ্রোতা বলবে, 'ধুরমশাই, আপনি বিজ্ঞান পড়ান, গান গাইবেন না।'

ভাষার গঠন আর কাজকর্ম মানুষে রনানান সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজের সঙ্গে জড়িত। যেভাবে রান্না আলাদা করে বুঝতে হলে শুধু মশলার রাসায়নিক গঠন দিয়ে হবেনা; তাতে বাঙালির আলু ভাজা-ভাতের তৃপ্তি বোঝা যাবে না;তেমনি ভাষাকে মানুষের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছাড়া বোঝা যায় না। ভাষা কে কে বল শব্দ-ধ্বনির 'আলাদাবস্তু' হিসেবে ব্যাখ্যা করতে গেলে সেটা হবে যেন বিশাল একছবির সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শুধু বলছি; 'এখানে ৫৫০ ন্যানোমিটারের আলো প্রতিফলিত হয়েছে।' শুনতে বৈজ্ঞানিক, কিন্তু ছবির আসল মায়া একেবারেই উধাও।

যদি ভাষাকে তার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে আলাদা করা না যায়, তবে বাইরে থেকে সেটি চাপিয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। তাই ভাষাকে স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ কিছু ভাবার কোনও মানেই হয় না। যদি এমন হতো, আমরা তা বুঝতেই পারতাম না। ভিটগেনস্টাইনের সিংহ আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে না, কারণ তার সঙ্গে আমাদের কোনও সাংস্কৃতিক মিল নেই। আমরা না তার মতো গর্জাই, না তার মতো শিকার করি। তাই শুধু ভাষাগত বোঝাপড়া নয়, যোগাযোগের আসল বিষয়টাই অনুপস্থিত। আমরা চাইলে

ভিটগেনস্টাইনের কথাটায় একটু রঙ চড়িয়ে বলতে পারি;সিংহের যদি সত্যিই বলার মতো কিছু থাকত ও, আমাদের বুঝবার সাধ্য থাকত না, আর তার বলারও কিছু থাকত না।

তবে এর মানে এই নয় যে প্রাণীর সঙ্গে যোগাযোগই সম্ভব নয়। যার ঘরে কুকুর-বিড়াল আছে সে জানে ওরা কী চমৎকার ভাবে নিজেদের দাবি স্পষ্ট করে জানাতে পারে। আমারই দুটো বিড়াল আছে;নানা, আসলে আমি-ইওদের চাকর-বাকর। ওরা যখন খেতে চায়, তখন এমন চোখ করে তাকায় যে আমি মনে করি যেন ফরাসি দার্শনিক রুশো নীতিবাক্য শোনাচ্ছে। রোদ্দুরে গাএলিয়ে দেবার সময় হলে ওরা আমাকে বিছানা সরিয়ে দিতে বাধ্য করে। আমিও ডেকে বলি, 'এসে খাবার খেয়ে উদ্ধার কর'- ওরা তখন বুঝেফেলে। কিন্তু এখানেই শেষ। ওরা বিদ্রূপ বোঝে না, শিল্প-সাহিত্যের স্বাদ নেয় না, মিথ্যে বলে না। আর আমি তো তাদের কাছে বসে অফিসের কাগজপত্রের যন্ত্রণা বা হোমলোন শোধ করার দুঃশ্চিন্তা উজাড় করে বললেও কোনও লাভ নেই। আমার বিড়াল তখন হাই তুলে বলে, 'আচ্ছা বাবা, আমাদের খাবারটা আগে দাও।' কেউ বলতেই পারে, 'ভাষা তো শিখতে পারি, তবে সিংহের ভাষা শেখা যাবে না কেন? যেমন একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ খুঁজে পাওয়া অচেনা ভাষা শিখে নেয়।' উত্তর হলো;না বাবাজি, হবে না। কারণ হারানো ভাষা আমরা বুঝতে পারি আমাদের অভিন্ন মানবীয় আচরণ ধরে। যারা সেই ভাষায় কথা বলত, তারা খেত, সংসার সামলাত, বাড়িঘর বানাত, ঝগড়া মেটাত;এইসব কর্মকাণ্ড থেকেই তাদের ভাষার জন্ম। আর সেই কর্মকাণ্ডের সঙ্গেই আমরা সম্পর্ক খুঁজে পাই। সিংহের সঙ্গে কিন্তু এসবের কোনও মিল নেই। হ্যাঁ, সিংহও খাবার জোগাড় করে, আর এদিক থেকে একটু মিল খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়;সিংহের খাবার ধরা আর মানুষের খাওয়া, এ দুইয়ের মধ্যে ফারাক আকাশ-পাতাল। সিংহ মাটিতে গলা চেপে হরিণ মারে, আর আমরা হাটে গিয়ে বাজারের দোকানদারদের সঙ্গে দরাদরি করি। সিংহের জন্য খাওয়া মানে দাঁত-নখর চালানো, আর আমাদের জন্য খাওয়া মানে হাজারো অনুষ্ঠান;সবজি ধোওয়া, মশলাবাটা, ভাত চাপা, 'আজ ডিম কারি হবে না মাছ ঝোল হবে' নিয়ে সংসারের ভেতর মহাযুদ্ধ। খাওয়ার সময়ও আমাদের নানারীতি;কে আগে নেবে, কে পরিবেশন করবে, কার কপালে ইলিশের মাথাটা উঠবে।

এমন জটিল সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠান সিংহদের নেই। ফলে আমাদেরসঙ্গে তাদের খাওয়ার মিল খুঁজে পেলে সেটা হবে একেবারে যেমন;'তুমি হাঁটো, আমিও হাঁটি, তাই আমরা একই রকম';এরকম দারুণ যুক্তি। অথচ একজন হাঁটছে কফিহাউসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে, আরেক জনহাঁটছে বনের ভেতর দাঁত বের করে শিকার তাড়া করতে। দু'জনের হাঁটার মিল ঠিক কতখানি তা ভাবলেই মজা পেয়ে যাবেন। যদি কোনও পশু আমাদের সঙ্গে কথা বলতে না পারে, তবে ঈশ্বরের ব্যাপারে কী বলা যায়? অনেকে বলেন, ঈশ্বর তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন;কখনও পবিত্র গ্রন্থের ভেতর দিয়ে, কখনও প্রকৃতির ইশারায়। বাইবেলের পাতায় তো সোজাসুজি লেখা আছে;'প্রভু এই বলছেন।' কিন্তু ভাই, যদি সিংহই আমাদের সঙ্গে কথা বলতে না পারে, তবে ঈশ্বর তো আরও একধাপ দূরে।

সিংহের সঙ্গে অন্তত এতটুকু মিল আছে যে আমরা একই পৃথিবীতে থাকি, একই রোদ্দুর-বৃষ্টিতে ভিজি, একই ক্ষুধা-তৃষ্ণা সামলাই। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে সেইটুকুও নেই। ফলে ভাষা ব্যবহার করে যোগাযোগের যে মৌলিক শর্ত দরকার;যে শর্তে মানুষের সঙ্গে মানুষের কথা হয়;সেটাই নেই ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে। এর মানে এই নয় যে মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত, স্নেহবোধে ভরা, ক্ষমার আশ্রয় পাওয়া, শক্তি

পাওয়া বা আত্মপক্ষ সমর্থিত হওয়ার অনুভূতি পেতে পারেনা। কিন্তু ঈশ্বর সোজা মুখে এসে বলতে পারবেন; 'দেখো, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম';এমনটা ঘটার উপায় নেই।

আসলে আমাদের ভাষা-ভাবনার মধ্যেই গলদ আছে। আমরা ভাবি ভাষা মানেই মনের ভেতরের কথা অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম। যেন ভাষা একটা খাম, তার ভেতরে চিন্তা ঢুকিয়ে দিলেই ডাকঘর হয়ে অন্যের কাছে পৌঁছে যাবে। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা অনেক বেশি কিচিরমিচির, অনেক বেশি চায়ের টেবিলের আড্ডার মতো, যেখানে আসল কথার পাশাপাশি রসিকতা, ভণিতা আর খানিক চা-দুধের ঝাঁঝও মিশে থাকে।

আমরা সাধারণত ভাবি ভাষার মধ্যে দু'টো ধাপ আছে;একটা ভেতরের, মানে আমাদের ভাবনা; আরেকটা বাইরের, মানে কথায় প্রকাশ। মনে হয় যেন আগে মাথায় বাক্য গড়ে উঠছে, তারপর সেটা মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়; এটা বেশির ভাগ সময় ঠিক চলে না। সত্যি কথা বলতে কী, বেশির ভাগ সময় আমরা স্রেফ বলে ফেলি। 'বৃষ্টি হচ্ছে'; এই কথাটা বলার আগে আমি কোনও সভা ডেকে মাথার ভেতর একলাইন লিখে রাখিনা। আমি যেমন বললাম, অপরজনও তেমন শুনল। সে আর বসে ভাবে না; 'আচ্ছা, কথার আড়ালে আসল মনের ভাব কী?'

হ্যাঁ, যদি সেভাবে আমার কথায় শুধু আবহাওয়ার খবর নয়, আরও কিছু আছে, তবে সেটা আমার চিন্তাবিশ্লেষণ করে নয়, বরং আমার ভঙ্গি-ভাষা দেখে। ধরুন আমি যদি গলা নামিয়ে বলি, 'বৃষ্টি হচ্ছে'; মুখের ভাব কাঁচুমাচু, কাঁধ ঝুলে পড়েছে;তাহলে শ্রোতা এক ঝটকায় বুঝবে, তওহে, তোমার মন খারাপ হয়েছে। 'আসলে সে আমার দুঃখটাই ধরে ফেলবে আমি নিজে স্বীকার করার আগেই। এখানেই আসল ফাঁকিটা ধরা পড়ে। যদি আমরা যুক্তির খাতিরে ধরে নিই ঈশ্বর সত্যিই ভাষায় আমাদের সঙ্গে কথা বলেন; ধরা যাক ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে;তবু ঝামেলা থেকেই যায়। কারণ ঈশ্বরের তো আমাদের মতো মুখভঙ্গি নেই, কণ্ঠস্বর নেই, দেহভঙ্গি নেই। ফলে সেই ভাষায় সবকিছু থাকলেও আসল যোগাযোগের যে মশলা;যেটা বাঙালির আড্ডায় চায়ের সঙ্গে বিস্কুট না থাকলে যেমন ফাঁকা লাগে;সেটাই অনুপস্থিত।

ধরে নিলাম, ভাষা মাঝে মাঝে চিন্তার মোড়ক হয়ে ওঠে। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে সেটার কোনও লাভ নেই। কারণ ভাষা কাজ করে তখনই, যখন দু'পক্ষের ভাষার জমি একই রকম। অথচ ঈশ্বরকে মানুষের থেকে যে জিনিসগুলো আলাদা করে;সর্বজ্ঞতা আর সর্বশক্তিমান হওয়া;সেগুলোই তো আমাদের ভাষার জমি আলাদা করে দেয়। ঈশ্বর যদি সব জানেনই, তবে সীমিত মানুষক'টা জানলেও বা কী হলো? তাঁর চিন্তার সঙ্গে আমাদের চিন্তার ফারাক যে গঙ্গা-যমুনা নয়, সরাসরি আটলান্টিক মহাসাগর! সিংহের সঙ্গে আমাদের ভাষার দূরত্ব যতোখানি, ঈশ্বরের সঙ্গে তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি।

কেউ হয় তো বলবেন, 'ঈশ্বর তো সবই পারেন, চাইলে নিশ্চয়ই মানুষের সঙ্গে কথা বলতেও পারবেন। দআহা, এযুক্তি তো নিজের পায়ে কুড়াল মারা। আপনি যতই ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান ক্ষমতার দিকে ইঙ্গিত করবেন, ঈশ্বর ততই আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবেন।

একটা তুলনা দেওয়া যাক। আমরা মানুষ কুকুর-বিড়ালের সঙ্গে খানিকটা যোগাযোগ করতে পারি; তওই শোন, মিউমিউ করছে, মানে খেতে চায়। দআবার কুকুরও ঘেউঘেউ করে জানায়, 'এ বাড়ির বাইরে কেউ ঢুকছে।' কিন্তু পিঁপড়ে বা মশার সঙ্গে তো আর বসে গল্প করা যায় না। ওরা যদি সংসদ গড়তে বসে, আমরা কিচ্ছু টের পাব না। ঠিক তেমনি ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের দূরত্বটা কুকুর-বিড়ালের সঙ্গে নয়, বরং

একেবারে পিঁপড়ের সঙ্গে মানুষের দূরত্বের মতো।

অর্থাৎ, ঈশ্বর যদি চানও, তবু সেই দূরত্বটা আমাদের জন্য এত বিশাল যে যোগাযোগের নাম করে যা হয় সেটা হবে শুধু কল্পনা, আর আমরা শুধু মাথা চুলকাব;'এটা কি ঈশ্বরের কথা, না আমাদেরই কানে বাঁশি বাজছে?'

ভাষা চলে শুধু তখনই, যখন সেটা সঠিক সামাজিক মঞ্চে বসানো হয়। ধরুন আমি হার্ডওয়্যারের দোকানে ঢুকে বললাম;'দুই ডজন একইঞ্চি ব্রাস সেলফ-ট্যাপার দিন।' দোকানদার একটুও মাথা চুলকাবে না, গুদাম থেকে মাল বার করতে করতে দিব্যি পাশের ছেলেকে বলবে;'শুনেছিস তো, ছুটিতে দিঘায় গিয়ে কী কাণ্ড করলাম!' মানে আমার কথার আসল উদ্দেশ্য ছিল কাজ উদ্ধার করা, ব্যাকরণ শোনানো নয়। কিন্তু যদি আমি রবিবার গির্জায় বা সোমবার সকালে কালীঘাট মন্দিরে দাঁড়িয়ে একই কথা বলি;'দুই ডজন ব্রাসসেলফ-ট্যাপার দিন';তাহলে লোকজন চমকে যাবে। কেউ ভাববে, 'লোকটার মাথায় ইস্ক্রু নেই, এখন আবার স্ক্রু খুঁজছে।' অন্য কেউ হয় তো প্রার্থনা ছেড়ে হেসে গড়াগড়ি যাবে।

অত এব বোঝা গেল, ভাষা একেবারে টুলবক্সের হাতিয়ার;সঠিক জায়গায় ব্যবহার না করলে ধোপে টিকবে না। আর এইসব সামাজিকপ্রেক্ষাপট যে একদিনে গড়ে ওঠেনি;তা তো পাড়ার আড্ডার মতোই বহু বছরেরজমাট বাঁধা ব্যাপার। আমি আজ স্ক্রু চাইতে পারছি কারণ বহু যুগ ধরে মানুষ মাপঝোক শিখেছে, ব্যবসা করেছে, দোকান খুলেছে, বাজারে ঠকেছে, ঠকিয়েছে। এখন ভাবুন তো, যদি ঈশ্বর সত্যিই আমাদের সঙ্গে কথা বলেন, সেটা কোন প্রেক্ষাপটে মানে পাবে? উনি তো কখনও নিউমার্কেটে গিয়ে ডাল-চাল কিনেন নি, ট্রেনে টিকিট কেটে কামরার বাইরে ঝুলে আসেননি, কিংবা অটোওয়ালার সঙ্গে ভাড়ার জন্য ধস্তাধস্তি করেননি। ফলে ঈশ্বরের ভাষা আমাদের কানে পড়লে সেটা হবে যেন ক্রিকেট মাঠে হঠাৎ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দাঁড়িয়ে গেছে;দেখতে দারুণ, কিন্তু খেলার ধারায় একেবারে বেমানান।

ধরা যাক, ঈশ্বর বললেন;'তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো।' বাহ, শুনতে কি সুন্দর! কিন্তু আদেশ মানে কী? আদেশ মানে এমন এক অবস্থা যেখানে একজন আদেশ দিতে পারেন আর অন্যজনকে সেটা মানতেই হবে;অথবা অন্তত মানা উচিত। শুনতে সহজ, কিন্তু আসলে ভীষণ জটিল।

ধরা যাক, আমার অফিসের বস যদি কাজের সময় বলেন;'তুমি আমার ড্রাইক্লিনিংটা নিয়ে এসো'; আমি করব, কারণ কর্মচুক্তি, দায়িত্ব ইত্যাদিসব মিলিয়ে তাঁর কথাটা আদেশ হিসেবে মানে পায়। কিন্তু যদি উনি অফিস শেষের পর বললেন;'ড্রাইক্লিনিংটা নিয়ে এসো';তখন সেটা আর আদেশ নয়, বরং অনুগ্রহ। হয়তো তার বদলে উনি বলবেন, তকাল আধাদিন ছুটিনাও।' মানে আদেশ আসলে সবসময়ই নির্দিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাঁধা। এখন আসি ঈশ্বরের কথায়। ঈশ্বরের আদেশের ক্ষেত্রে সমস্যা হলো;আমাদের সঙ্গে তাঁর তো কোনও সামাজিক প্রেক্ষাপট নেই। তিনি তো অফিসের বস নন যে প্রমোশনের ভয় দেখাবেন, আবার শ্বশুরবাড়ির মাসি-পিসিও নন যে না মানলে রাগ করে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। ফলে ঈশ্বরের আদেশ আসলে মানে পায় কে বল তখনই, যখন সেটা মানুষের আদেশের ছায়া হয়ে ওঠে।

আসলে ঈশ্বরের আদেশগুলো মানে হয় কেবল তখনই, যখন আমরা মানুষরাই সেটাকে নিজেদের আদেশ বানাই। ইতিহাসে যত ঈশ্বর-নির্দেশের গল্প, সবই তো মানুষরাই মানুষের কানে শোনাচ্ছে;'ঈশ্বর একথা বলেছেন।' মানে আদেশটা দেবতার নয়, এজেন্টটা মানুষই।ঈশ্বরের আদেশ মানে তাই বিশেষ ধরনের মানব-আদেশ। তার মানেটুকু টিকে থাকে কেবল সেই দীর্ঘ সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে,

যেখানে মানুষই ঈশ্বরের হয়ে ভাষণ দেন।

অতএব 'ঈশ্বরের আদেশ 'বলতে যা বোঝানো হয়, আসলে তা মানুষের আদেশেরই একখানা নতুন ব্র্যান্ডিং। যেমন আলুর দম আর দম-আলু আলাদা নাম হলেও থালায় খেলে বুঝবেন;মশলাটা তো একই। চলুন আবার ফিরি ভিটগেনস্টাইনের সেই সিংহের কাছে। ধরুন, একদিন সত্যিই সিংহের মুখ থেকে ঝরঝর করে বোধগম্য ভাষা বেরোতে শুরু করল। তখন নিঃসন্দেহে বলা যাবে;সিংহ নয়, আসলে মানুষই বলছে। একই ভাবে, কেউ যদি দাবি করে;'ঈশ্বর আমার সঙ্গে কথা বলছেন' বা 'ঈশ্বর আমার মাধ্যমে বলছেন'; তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখুন, আসলে মানুষই বলছে। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, ভদ্রলোক (হ্যাঁ, বেশির ভাগ সময় পুরুষই) বুঝে গেছেন তাঁর কথাটা এতটা বেয়াড়া আর বোকাটে যে, সেটাকে জোর খাটাতে হলে ঈশ্বরের সীলমোহর দরকার। সংক্ষেপে, ঈশ্বরের ভাষা শোনে কারা? শুধু তারা, যাদের দুঃসাহস আছে নিজের স্বার্থ আর আত্মপ্রসাদকে ঈশ্বরের বাণী বলে চালিয়ে দেওয়ার। যেন একেবারে গলি ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন নিজেকে ভেবে বসেছে;'আমি-ই ভারতীয় দলের অধিনায়ক, শুধু বাকি দেশটা জানে না।'

সমাপনী:

সঞ্জয় বলিলেন;

হে ধৃতরাষ্ট্র! এত কথা কয়ে শেষে দধীচি মুনি ক্লার্ককে বলিলেন;

'দেখো দার্শনিক, ঈশ্বরের ভাষা আমরা বুঝব না;এটাই স্বাভাবিক। কারণ আমরা তো এখনও নিজেদের স্ত্রীর ভাষাই অর্ধেক বুঝি, শ্বশুরবাড়ির ভাষা পুরোপুরি ভুল বুঝি, আর অফিসের বসের ভাষা ইচ্ছে করে না-বুঝি।এই অবস্থায় ঈশ্বর যদি সত্যিই কিছু বলেন, তাহলে সেটা যে কারও শাশুড়ির উপদেশের মতোই;শোনা যায়, কিন্তু মানা যায় না।'

ক্লার্ক তখন হেসে বললেন;

'হে মুনি, এতদিনে বুঝলাম;ঈশ্বরের চেয়ে ভয়ংকর আসলে মানুষের নিজের ব্যাখ্যা!'

সঞ্জয় বলিলেন;

এইভাবে আলোচনার শেষ হইল। ঈশ্বর কিছু বললেন কিনা, তা অজানা রইল। কিন্তু দধীচি মুনির কথায় স্পষ্ট হলো;বাঙালিরা দর্শনকে যতই উল্টো পাল্টা করুক, ইয়ার্কি তারা ছাড়বে না।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

Clarke, D. (2016). If God could talk, we wouldn't be able to understand him. Think, 15(44), 15-22.

Ellis, D. (2025). If an alien could talk, could we understand it?. In Exophilosophy (pp. 115-127). Routledge.